নদী এবং পানিসম্পদের ওপর সকল আগ্রাসন প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন – কমরেড খালেকুজ্জামান

[ভারত কর্তৃক টিপাইবাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে গত ৬ জুন সিলেটের নগর ভবন পয়েন্টে জনসভা ও পরদিন স্থানীয় জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্রে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভার প্রধান বক্তা বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান যে বক্তব্য রাখেন, সামান্য সম্পাদনা সাপেক্ষে এখানে তা প্রকাশ করা হল - সম্পাদক]

আজ আমরা একটা অত্যন্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য সভা আহ্বান করেছি। সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা নদী রক্ষা তথা লক্ষ কোটি মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন নিয়ে সিলেট-সহ সমগ্র দেশবাসী ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এর উদ্দেশ্য। কিন্তু সকালেই পুলিশ এসে কোনো কথা না শুনে মঞ্চ ভেঙে দেয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে আগেই অবহিতপত্র দেয়া হয়েছিল এবং তাতে তারা সম্মতিও দিয়েছিলেন। তারপরও পুলিশের এ কাণ্ড-কীর্তি আমাদের বোধগম্য হয়নি। সরকারের দিনবদলের এটা একটা নমুনা কিনা তাও বোঝা সম্ভব হয়নি। কারণ সরকারের উপর মহলের নির্দেশেই এ কাজ পুলিশ করেছে, নাকি বিগত জোট সরকারের আমলে আস্থাভাজন হতে গিয়ে যে জাতীয়তাবাদী সিল কিছু পুলিশ কর্মকর্তার গায়ে মারা হয়েছিল তা মুছে নব আস্থা স্থাপনের প্রয়াস থেকে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে কিংবা কোনো মহলের উসকানিতে অতি উৎসাহে ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টা থেকে এটা হয়েছে তা নির্ণয় করা সরকার এবং প্রশাসনের দায়িত্ব। তবে কাজটা জঘন্য এবং এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী-স্বৈরাচারী আচরণ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সরকার এবং প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সভা থেকে দাবি জানাচ্ছি।

একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর সমাজবদ্ধ জীবনপ্রণালী গড়ে ওঠার পেছনে উৎপাদন পদ্ধতি যেমন কাজ করে তেমনি তাদের জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা ও সুস্থ জীবন বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের ওপর। অর্থাৎ যে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের ওপর তাদের টিকে থাকা না থাকা অনেকটা নির্ভর করে। যে-পরিবেশে বাংলাদেশের মানুষ বেড়ে উঠেছে সে-পরিবেশ আফগানিস্তান, সাইবেরিয়া কিংবা অন্য সর্বত্র নেই। বাংলাদেশের এই ব-দ্বীপ ভূমি জেগে উঠেছে প্রধানত হিমালয় ও অন্যান্য পর্বতমালা থেকে নেমে আসা এবং বৃষ্টি ধোয়া নদী-বাহিত পলি দ্বারা। আর মানুষ লালিত হয়েছে নদী-নালা-খাল-বিল-হাওড়-বাওড়, বন-বাদাড় সমৃদ্ধ পরিবেশ-প্রকৃতির ছায়ায় মায়ায়। নির্মম ধনবাদী শোষণের পরও এই পরিবেশই একটা ক্ষুদ্র ভূমিতে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলেছে। যে কারণে নদী আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাই বলা হয়ে থাকে নদীর প্রবাহই বাংলার প্রাণ-প্রবাহ। কিন্তু বাইরের ও ভিতরের হামলার মুখে নদী এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবন আজ বিপন্ন দশায় পতিত হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের হৃদয়-জুড়ে প্রবাহিত বারো শত নদ-নদীর নাম পাওয়া যেত। বাংলাদেশের একজন কবি তার কবিতায় ১৩শ’ নদীর নাম উল্লেখ করেছেন। এখন তা ২শ’ ৫৪টিতে এসে ঠেকেছে। তাও শুষ্ক মৌসুমে ১৭/১৮টির বেশি নদী সচল থাকে না। এখন একে রক্ষা করতে না পারলে আমাদের শেষ-রক্ষা হবে না।

বাংলাদেশ ভারত-বেষ্টিত এবং সামান্য কিছু অংশ বার্মার পাশে লেগে আছে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম পলিবাহিত ব-দ্বীপ বাংলাদেশ, যা পরাক্রমশালী নদী গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) বেসিন বা অববাহিকার সৃষ্টি। এর প্রবাহিত এলাকা প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বর্গকিলোমিটার যার ৭.৫% বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে। বাংলাদেশের চার-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড তৈরি হয়েছে গঙ্গা (পদ্মা)-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (বরাক) নদী সিস্টেমের মাঝে। এই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী ব্যবস্থা ৫টি দেশ যথা ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন ও বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে। এই এইগ অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে এবং নির্ভর হয়ে পৃথিবীর প্রায় ১০ ভাগ মানুষ বাস করে যদিও তা পৃথিবীর মোট স্থলভূমির মাত্র ১.২ ভাগ। এই পানি সম্পদ আমাদের খাওয়া, গৃহস্থালিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ-এর কাজে লাগানো, সমুদ্রের লোনাপানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষা করে কৃষি-বন ও আর্সেনিকের মতো বিষক্রিয়া রোধ, নৌ চলাচল, প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ আহরণ ও মাছের চাষ করা, পানির দূষিতকরণ রোধ করা, শিল্প-কারখানার জন্য পানি সরবরাহ, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশুর খামারের জন্য পানি, বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ নানা প্রয়োজন পূরণ করে। এইভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের জলপ্রবাহের সাথে আমাদের জীবনপ্রবাহ সম্পর্কিত হয়ে আছে।

গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা (বরাক) এই বড় এবং প্রধান ৩টি নদ-নদীসহ ৫৪টি ছোট-মাঝারি নদী ভারত থেকে এবং বার্মা থেকে ৩টি নদী – মোট ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে। এই ৫৪টি নদীর মধ্যে ৪৮টি নদীর পানি প্রবাহকে ভারত একতরফাভাবে নানা প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন গঙ্গা নদী, এর উৎপত্তি হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে ২৩ হাজার ফুট উচ্চতায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে। দক্ষিণ পূর্বে ও পূর্ব দিকে প্রায় ১ হাজার মাইল অতিক্রম করে এই নদী পদ্মা নাম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই দীর্ঘ পথে ভারত উত্তর প্রদেশ, বিহার ইত্যাদি স্থানে অসংখ্য বাঁধ ও সংযোগ খাল করে সেচের জন্য পানি সরিয়ে নেয়ায় পশ্চিমবঙ্গে ভাগিরথী-হুগলী নদীর পানি প্রবাহ কমে আসে। এটা পূরণ করে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বাড়ানো ও সেচের জল যোগান দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সীমানার ১১ মাইল উজানে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা নামক স্থানে ফারাক্কা বাঁধ দেয়া হয়। ১৯৫১ সালে ভারত এ পরিকল্পনা করে এবং ১৯৬১ সালে বাঁধের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭৪ সালে তা শেষ হয়। পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধ চালুর কথা বলে তারা স্থায়ীভাবে চালু করে দেয়। যার ফলে বাংলাদেশের ৩৭ ভাগ অঞ্চল ও ৩ কোটি মানুষ চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এখন আবার মেঘনার উৎসমুখ বরাক নদীতে বাঁধ দিয়ে সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনার ওপর নামিয়ে আনা হচ্ছে নতুন আক্রমণ।

ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের ওপর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সেজন্য ট্রানজিট (বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারত থেকে ভারতে যাতায়াত)-এর বিষয়টি বারবার আসছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে আর্থিক-সামরিক সাম্রাজ্য ও আধিপত্য বিস্তারের বিশদ পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের। তারই অংশ হিসাবে এবং ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মুনাফা বাণিজ্য সম্প্রসারণের তাগিদে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের পানি, তেল, কয়লা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে ৫০ থেকে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইস্পাতসহ ভারী শিল্প স্থাপন, বাণিজ্যিক ও পর্যটন সমৃদ্ধ এলাকা স্থাপন, সামরিক স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও প্রকল্প নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে। সাধারণ জনগণের স্বার্থ এতে তেমন না থাকায় টিপাইবাঁধ বিরোধী একটা বড় আন্দোলন মনিপুর-মিজোরাম জুড়ে চলমান রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ-সংগ্রামও একভাবে রয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী পকিস্তানের বিপর্যস্ত দশা ভারতকে স্বস্তি দিয়েছে। এখন প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। চীনের উত্থান ও চীন-রাশিয়ার মিলিত নব সুপার পাওয়ারকে চতুর্দিক থেকে (মধ্য এশিয়া, পূর্ব-ইউরোপ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান) বেষ্টনি দিয়ে হুমকি এবং ভারসাম্যের মধ্যে রাখার মার্কিনী রণকৌশলের সাথে ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার কৌশলের কাকতালীয় মিলকেও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা দরকার।

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহকে কেন্দ্র করে এই মহাপরিকল্পনার একটা অংশ হচ্ছে টিপাইমুখে বরাক নদীতে বাঁধ। বরাক নদী পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব্রহ্মপুত্র-বরাক-মেঘনা বেসিনের অংশ। ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত গড়িয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বরাক নদী উত্তর-পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী প্রবাহ (Drainage system)| এই নদী মনিপুর রাজ্যের সেনাপতি জেলার লাইলিয়াই (Lailyai) গ্রাম এর কাছে পার্বত্যভূমি থেকে উৎপত্তি হয়েছে। বরাকের উজান এলাকা মনিপুর রাজ্যের সমগ্র উত্তর, উত্তর পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা জুড়ে রয়েছে। বরাকের মধ্য স্রোত আসাম রাজ্যের সমতল কাছার (Cachar) এলাকা দিয়ে প্রবাহিত। আর নিম্ন প্রবাহ বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিলেট জেলার জকিগঞ্জে অমলসিদ পয়েন্টে ঢুকে সুরমা-কুশিয়ারায় প্রবাহিত হয়ে ভৈরবে এসে মেঘনায় রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। মেঘনা নদী প্রায় ৬৫০ মাইল দীর্ঘ। গভীর এবং প্রশস্ত এ নদী দেশের সবচেয়ে দীর্ঘ নদীও। সুরমা এবং কুশিয়ারা নদী সিলেট জেলা অতিক্রম করে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার সীমান্তে মারকুলীতে এসে কালনি নদী নামে কিছুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের কাছে পুরনো ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। তার পর দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত স্রোতধারায় দক্ষিণে নোয়াখালী ও ভোলা দ্বীপের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকা জেলার কিছু অংশ, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে মেঘনা তার বিখ্যাত দুটি উপনদী তিতাস ও ডাকাতিয়াসহ বহু শাখা নদীসহ প্রবাহিত হয়েছে। এই নদী বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির পানি বহন করে চলে। একে চিরযৌবনা নদী বলা হয় কারণ এর প্রবাহে বড় ধরনের ভাটা কখনো আসেনি। এখন টিপাইবাঁধ একে বার্ধক্য এবং মুমূর্ষু অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে যা বাংলাদেশের একটা বিশাল এলাকাকে বিরানভূমিতে পরিণত করবে।

বাংলাদেশের অমলশিদ সীমান্ত থেকে ১৯৫ কিলোমিটার উজানে আসাম-মিজোরাম সীমান্তে টিপাইমুখ গ্রামের সন্নিকটে তুইভাই ও বরাক নদীর মিলনস্থলের ৫০০ মিটার নিচে এই বাঁধ নির্মিত হবে। এই বাঁধ ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্মিত হবে। এর উচ্চতা হবে ১৬২.৮ মিটার যা ৫০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু হবে এবং লম্বা ৩৯০ মিটার অর্থাৎ প্রায় অর্ধকিলোমিটারের কাছাকাছি।

ভারতের জল কমিশন ১৯৮৪ সালে প্রথম টিপাইমুখ বাঁধের প্রস্তাব করে। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপর ১৯৯৫ সালে ব্রহ্মপুত্র বোর্ড একটি প্রতিবেদন তৈরি করে এবং ১৯৯৯ সালে উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ কর্পোরেশন লিমিটেড এর কাছে হস্তান্তর করে। ২০০৩ সালে তা অনুমোদন লাভ করে। ২০০৪ সালের ২৩ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং টিপাইমুখ বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা দেন। এক পর্যায়ে তা স্থগিত হয়। তারপর ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী জোট-মহাজোটে বিভক্ত হয়ে ঢাকার রাজপথে সহিংস সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়া না হওয়া নিয়ে নানা বিতর্ক, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চলছে তখন ভারতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী ও ভারী শিল্পমন্ত্রী বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১১ সালের মধ্যে এই বাঁধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে বলে তারা ঘোষণা করেন। এখানে লক্ষণীয় যে এরশাদের শাসনামল থেকে এ পরিকল্পনা ও নানা উদ্যোগ শুরু হয়। তারপর দীর্ঘ সময় বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ পালাক্রমে ক্ষমতাসীন হয়েছে। জামায়াত-জাতীয় পার্টি ক্ষমতার শরীক থেকেছে। একদিকে ভারত যেমন সকল আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও রীতিনীতি ভঙ্গ করে উজানের দেশে একতফাভাবে বাঁধের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেমনি বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও এ বিষয়ে নির্বিকার থেকেছে। তাদের তেমন কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা ২০০৫ সালের ১ ও ২ মার্চ সিলেট-জকিগঞ্জ লংমার্চ করেছি। সেমিনার, মানববন্ধন, সভা-সমাবেশ করে নানাভাবে সরকারসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। আরও কিছু সংস্থা ও সংগঠনও এ বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিল। কোনো ফল হয়নি। ভারত সরকারের আন্তঃনদী সংযোগ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও আমরা ২০০৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ ঢাকা-কুড়িগ্রম লংমার্চ করেছি। এবারও আমরা বর্তমান সরকারের শাসনামল শুরু হওয়া থেকেই সরকারের সতর্ক হওয়ার এবং উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলে আসছি। তারই অংশ হিসাবে সিলেটে এই জনসভা এবং বৃহত্তর সিলেট থেকে সর্বদলীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান।

এই বাঁধের কাজ বহু আগেই শুরু হয়ে যেত যদি না মনিপুরের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ পূর্বাঞ্চলীয় মনিপুর-মিজোরাম রাজ্যের জনগণ এবং নানা স্তরের ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞগণ এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতেন। শুরুতে মনিপুর রাজ্য সরকারও এর বিরুদ্ধে ছিল। পরে কংগ্রেস সরকার তাদের বাগে আনতে সমর্থ হয়। তাদের বিরোধিতার কারণ এই ছিল যে বাঁধ নির্মিত হলে মনিপুর রাজ্যের ৩১১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে যাবে। যার মধ্যে আছে ২২৯.১১ বর্গ কি.মি. সংরক্ষিত বনভূমি আর আবাদী কৃষি জমি ও আবাসন এলাকা। এতে জেলিয়াংগ্রং (Zeliangrong) ও হামার (Hmar) আদিবাসীর ৪০/৫০ হাজার লোক উচ্ছেদ হয়ে যাবেন। আমাদের কাপ্তাই বাঁধে যেমন অবস্থা হয়েছিল পার্বত্য আদিবাসীদের। তাছাড়া এই বিশাল বাঁধটি যে অঞ্চলে তৈরি হতে যাচ্ছে তা একটা ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। ১৯১৮ সালের ৭ মাত্রার রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প সহ ১০০ বছরের ভূকম্পন প্রবণতা থেকে এ ঝুঁকি উপেক্ষা করার মতো নয়। তাছাড়া আসাম-মনিপুর-মিজোরামের একটা অঞ্চলে বর্ষায় বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তারা দেখেছেন। বাংলাদেশের দুর্গতি ও চরম সর্বনাশের বিষয়টিও দু'-চারজন বিশেষজ্ঞ বলার চেষ্টা করেছেন।

এই বাঁধের উজানে ভাটিতে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি হবে, বিশেষজ্ঞদের এই মতামত উপেক্ষা করে ভারতের কেন্দ্রীয় জল কমিশন (Central water commission of India) বলতে চাইছে যে এতে উজান এবং ভাটি অঞ্চলে বন্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে তা পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের চাহিদার তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশও বিদ্যুৎ কিনে তার চাহিদা পূরণ করতে পারবে। একসময় তারা এও বলেছিলেন যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত অমলশিদ থেকে ১০০ কিলোমিটার উজানে এবং বাঁধের ৯৫ কিলোমিটার ভাটিতে তারা আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করবে যার সাহায্যে আসামের কাছাড় জলসেচ প্রকল্প (Cachar irrigation Project)-কে কার্যকর করা যাবে, বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা যাবে এবং বরাক নদীর সাথে সংযুক্ত শাখা নদী গুলিতেও শীত মৌসুমে পানি সরবরাহ করে নাব্যতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এরপরও কি বুঝতে বাকী থাকে যে বাংলাদেশের সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা নদীর কি পরিণতি হতে যাচ্ছে?

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) পরিচালিত এক সমীক্ষায় বলা হয়, এই বাঁধ চালু হলে বরাক নদীর অমলশিদ পয়েন্ট পানি-প্রবাহ কমে যাবে জুন মাসে ১০%, জুলাইয়ে ২৩%, আগস্টে ১৬% এবং সেপ্টেম্বরে ১৫%। পানির গড় উচ্চতা অমলশিদ পয়েন্টে জুলাই মাসে ১ মিটারের বেশি নেমে যাবে এবং এই গড় উচ্চতা হ্রাস পাবে যথাক্রমে ফেঞ্চুগঞ্জ, শেরপুর ও মারকুলি স্টেশনে ০.২৫, ০.১৫ ও ০.১ মিটার করে। একই সময়ে সুরমা নদীর কানাইরঘাট ও সিলেট স্টেশনে পানির গড় উচ্চতা হ্রাস পাবে যথাক্রমে ০.৭৫ ও ০.২৫ মিটার করে। শুকনো মৌসুমে যেমন জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরে পানির প্রবাহ ২৭%, ১৬% ও ১৪% কমবে।

সিলেট-সুনামগঞ্জ-মৌলভীবাজার এলাকার হাওড়গুলো সুরমা-কুশিয়ারা থেকে পানি পায়। কিন্তু ওই দুই নদীতে পানি-প্রবাহ কমে গেলে সিলেটের ৩০ হাজার ২শ’ ১৩ হেক্টর এবং মৌলভীবাজারের ৫ হাজার ২শ’ ২০ হেক্টর এলাকা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। কুশিয়ারা-বরদাল হাওড় (wet land) যা কুশিয়ারা নদীর বাম তীরে অবস্থিত তা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে। কাওয়ার দিঘি ((Kawardighi) হাওড় ও হাকালুকি হাওড়ে তুলনামূলক কম ক্ষতি হলেও তা নিতান্ত কম হবে না। এর প্রভাব পড়বে গোটা এলাকার ভূপ্রকৃতির ওপর। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও নিচে নেমে যাবে। শুষ্ক মৌসুমে স্রোত কমে যাওয়ার কারণে বাঁধের ১০০/১৫০ কি.মি. নিম্নাঞ্চলে নদীর তলদেশে ক্রমে পলি জমার পরিমাণ বাড়বে এবং এর ফলে নদীর প্রবাহ দুই তীর ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করবে, ভাঙনের হার বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মেঘনার পানি-প্রবাহে ভাটা পড়লে সমুদ্রের লোনা পানি আরো অধিকমাত্রায় ভেতরের দিকে প্রবেশ করতে থাকবে যার নিশ্চিত পরিণতি মরুকরণ।

এ অবস্থায় বাংলাদেশের সামনে উপায় কি? বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণের সামনে অনেকগুলো দায়িত্ব। আমাদের সরকারের উচিত অবিলম্বে ভারতের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে বিষয়টি উত্থাপন করা। পৃথিবীর অনেক বড় নদীই একাধিক দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর পানি বণ্টন নিয়ে দ্বিপাক্ষিক-বহুপাক্ষিক বিরোধ নিস্পত্তি করার জন্য ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে গৃহীত হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন বা নীতিমালা। বহু দেশই এ নীতিমালা অনুসরণ করে তাদের মধ্যকার অভিন্ন নদীর পানি প্রবাহ ও বণ্টন সমস্যার সমাধান করেছে। এই নীতিমালার ৪ ও ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত দেশ, অভিন্ন নদী ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন বিবেচনা করবে। এ জন্য অবশ্যই যেন অন্য দেশের কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একই আইনের ২৯(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, একটি রাষ্ট্র নদী অববাহিকার যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তার যে কোনো প্রস্তাবিত অবকাঠামোর নির্মাণ এবং ইনস্টলেশনের ব্যাপারে নদী অববাহিকায় অবস্থিত অন্য যে কোনো রাষ্ট্র, এই কাজের ফলে অববাহিকায় ঘটা পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে এ ব্যাপারে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশ গ্রহীতা দেশটি যেন প্রস্তাবিত পরিবর্তনের সম্ভাব্য ফলাফলের বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী থাকতে হবে। প্রায় অনুরূপ কথা বলা হয়েছে ১৯৯৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘের নদী কনভেনশনের (UN Convention on the Law of Non Nevigational Uses of International Water Courseং) ১২ নম্বর আর্টিকেলে। ফলে বরাক-মেঘনা-সুরমা-কুশিয়ারার পানি বণ্টন ও অন্যান্য বিষয়ে এ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ভারত, বাংলাদেশসহ চীন এবং ভুটানকে যুক্ত করে আলোচনা হতে হবে। আর ভাটির দেশ হিসাবে বাংলাদেশের স্বার্থ বা ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে সর্বাগ্রে।

টিপাইবাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করে ভারত যে শুধু আন্তর্জাতিক আইন, রীতি-নীতি লঙ্ঘন করেছে তাই নয়, ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত গঙ্গা চুক্তির অঙ্গীকারও লঙ্ঘন করেছে। ওই চুক্তিতে আমাদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি, সেটা আমরা অন্যত্র বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছি। কিন্তু তারপরও ওই চুক্তিতে বলা হয়েছিল উভয় দেশের সীমানার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানির অংশীদারিত্ব পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে করা এবং নিজ নিজ দেশের বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক মঙ্গলের স্বার্থে জলসম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারে উভয় দেশ সচেষ্ট থাকবে। কিন্তু ভারত যে শুধু পদ্মা (গঙ্গা) নদীর পানি বণ্টন নিয়ে আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করেছে তাই নয়, অনেকগুলো নদীর উজানে ছোট-বড় বাঁধ দিয়েছে। ইতোমধ্যে তারা ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি প্রত্যাহার করে নেওয়ার লক্ষ্যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আমাদের শাসকরাও এ বিষয়গুলো নিয়ে নির্বিকার ঔদাসীন্য দেখিয়ে কার্যত ভারতের অন্যায্য উদ্যোগকেই সহায়তা করে চলেছে।

টিপাইবাঁধসহ ভারতের অন্যান্য পরিকল্পনা নিয়ে দেশের ভেতরে যেমন সর্বব্যাপক সচেতনতা ও জনমত গড়ে তুলতে হবে তেমনি ভারতের গণতন্ত্রমনা, প্রগতিশীল জনগণ এবং রাজনৈতিক শক্তির সাথেও আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বৃদ্ধি করার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কারণ ভারতের শাসকগোষ্ঠী আর ভারতের জনসাধারণ এক নয়।

এখানে আরো একটি বিষয় বলে রাখা দরকার। আমাদের নদীর পানির ওপর ভারতের আগ্রাসী থাবা যেমন আছে তেমনি আছে আমাদের শাসকদের পরিকল্পনাহীনতা, উদাসীনতা। পানিসম্পদ এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য মতে, ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে চালু নৌপথের আয়তন ছিল ২৫ হাজার ১শ’ ৪০ নটিক্যাল মাইল। ১৯৭২ সালে এই আয়তন কমে দাঁড়ায় ১২ হাজার নটিক্যাল মাইল। আর বর্তমানে নৌপথের আয়তন মাত্র ৫ হাজার ৯শ’ ৬৮ নটিক্যাল মাইল; শুষ্ক মৌসুমে এটা নেমে আসে ২ হাজার নটিক্যাল মাইলে। নদীর তলদেশে পড়া পলি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিং হয় না বললেই চলে। এ কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয় না। এছাড়া অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ, রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ নদীর গতিপথকে বাধাগ্রস্ত করেছে। শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নদী-খাল-বিল-জলাশয় দখলের মহোৎসব চলেছে। আর পাল্লা দিয়ে চলছে নদীর দূষণ ও দখল। শুধু ঢাকার আশেপাশে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর একটা বড় অংশ দখল এবং ভরাট হয়ে গেছে আর প্রায় সাত হাজার ছোট-বড় শিল্প-কলকারখানার বর্জ্যে পানি সীমাহীন মাত্রায় দূষিত হচ্ছে। এর কোনো প্রতিকার নেই। এক কথায় যে নদী এবং পানির সাথে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত সেই নদী এবং পানির ওপর সর্বদিক থেকে সর্বনাশা আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে।

আমাদের শাসকগোষ্ঠী যে শুধু মানুষকে শোষণ-লুণ্ঠন করছে তাই নয়, এ মানুষ যে প্রকৃতির ওপর ভর করে বেঁচে আছে তাকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। আর তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটা সর্বব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।